দেশ

১২ শ্রাবণ ১৪০২ • ২৯ জুলাই ১৯৯৫ • ৬২ বর্ষ ২০ সংখ্যা

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

অর্থনীতিই আজ রাজনীতি

অর্থনীতির সব চলতি এবং পূর্ব-চলিত কাঠামোই ব্যর্থ আর রাজনৈতিক নৈরাশ্যও সীমাহীন। এই অবস্থায় রাজনীতি ও অর্থনীতির সম্বন্ধকে নতুন করে খতিয়ে দেখে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক স্তরে উন্নত করে তোলা প্রয়োজন। সেই পথের সন্ধান করেছেন *অনির্বাণ চট্টোপাধ্যায়*। • ২১

সাহিত্য

আশাপূর্ণা দেবী

আশাপূর্ণা দেবী ছিলেন বাঙালির অন্তঃপুরের অন্তঃপুরিকা, কিন্তু এমন এক মহীয়সী স্বভাব-লেখিকা চিরকালের বিরল দৃষ্টান্ত। নারীর অন্তরের সকল সুষমা ও যন্ত্রণা কী অবলীলায় শিল্প-মহিমায় পূর্ণ করে চলে গেলেন তিনি। স্মরণ-অর্ঘ্য নিবেদন করেছেন *মহাশ্বেতা দেবী ও পার্থ বসু*। • ২৯

প্রবন্ধ

মরণাপন্ন কাতর পরীক্ষা ব্যবস্থা

পরীক্ষা-ব্যবস্থার চেয়ে চরম কৌতুককর প্রহসন আর কী হতে পারে! এ-নিয়ে গভীর প্রবন্ধ লিখতে গেলেও রচনার পরতে পরতে কৌতুকের ছটা মিশে যায়। এ প্রহসন সবারই জানিত বিষয়, সমগ্র প্রেক্ষায় তাকে সমূল তুলে ধরেছেন *সুনন্দ সান্যাল*। • ৩৫

প্রবন্ধ

একটি দুর্লভ ব্রতকথা ও রবীন্দ্রনাথ

'মেয়েলি ব্রতকথা'র সংগ্রাহক ও প্রকাশক ছিলেন অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়। রবীন্দ্রনাথের ঐকান্তিক আগ্রহে ও পরামর্শে যত্নবান হয়ে লোকসাহিত্যের এই মূল্যবান কাজটি সম্পন্ন করেছিলেন তিনি। এ বিষয়ে আলোকপাত করেছেন *শ্রীলেখা চট্টোপাধ্যায়*। • ৭৭

ভ্রমণ

দুধ-মাখনের দেশে রেলভ্রমণ

নিউজিল্যান্ড দেশটা কোনও অখণ্ড ভূখণ্ড নয়, কতগুলি দ্বীপের সমষ্টি। লেখক সেই দেশের এক শহর থেকে অন্য শহরে গেছেন রেলপথে। কী দেখেছেন লেখক সেখানে; কেমন সেই চিত্রসদৃশ দ্বীপভূমি? লেখক *পরীক্ষিৎ বসু*। • ৬৫

অ • ন্যা • ন্য

প্রচ্ছদ • রণদীপ মুখোপাধ্যায়

আনন্দ বাজার পত্রিকা লিমিটেডের পক্ষে বিজিৎকুমার বসু কর্তৃক ৬ ও ৯ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০০১ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। বিমান মাশুল : ত্রিপুরা ২০ পয়সা। উত্তর-পূর্ব ভারত ৩০ পয়সা।

Desh (US PS 007-887) is published fortnightly for an annual subscription of $54.00 by ANANDA BAZAR PATRIKA LTD., 6 PRAFULLA SARKAR STREET, CALCUTTA 700 001, INDIA. Our distributor in USA is HOUSE OF ANANDA, 113 Lexington Ave, Rear New York, NY 10016, Second Class Postage paid at New York 10199, Post Master Please send address change to PRABASI, P.O. BOX 1833, New York NY 10010.

একটি দুর্লভ ব্রতকথা ও রবীন্দ্রনাথ

শ্রী লে খা চ ট্টো পা ধ্যা য়

রবীন্দ্রনাথ তাঁর বহুব্যাপ্ত কর্মের পাশাপাশি আজীবন, সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁর অনুজদের নানাভাবে সাহিত্য-রচনার প্রেরণা দিয়েছেন ; কখনও বিষয় নির্বাচন করে, কখনও কেবলমাত্র সাহস ও প্রত্যয় জুগিয়ে। অন্যদের উৎসাহিত করতে বহু সাময়িক পত্র, লিট্‌ল্ ম্যাগাজিন, এমন কী বিজ্ঞাপনের বয়ানও অকৃপণ হাতে লিখে গেছেন। এছাড়া বহু গ্রন্থের ভূমিকাও তিনি রচনা করেছেন। বহুল প্রচারিত দীনেশচন্দ্র সেনের 'রামায়ণী কথা'র ভূমিকা এর অন্যতম। সেটি লেখা হয় ৫ পৌষ, ১৩১০-এ। বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য এমনই একটি বই হল অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় সঙ্কলিত 'মেয়েলি ব্রত'। ভূমিকার শেষে রবীন্দ্রনাথের স্বাক্ষরের পাশে মুদ্রিত তারিখ হল ৭ কার্তিক, ১৩০৩। রবীন্দ্রবিদ্ পুলিনবিহারী সেন 'শনিবারের চিঠি'তে রবীন্দ্রনাথের রচনাপঞ্জী সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে শুরুতেই রেখেছেন এই বইটিকে। সুতরাং ধরে নেওয়া যেতে পারে এটিই রবীন্দ্রনাথের লেখা প্রথম ভূমিকা।

সাধনা পত্রিকা প্রকাশ কালে রবীন্দ্রনাথ লোকসাহিত্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণে বিশেষভাবে উদ্যোগী হয়েছিলেন। তাঁর আন্তরিক বিশ্বাস ছিল, যে সাহিত্যের মূল নিহিত রয়েছে সমাজের অন্তরে, তাকে অস্বীকার করার উপায় নেই। রবীন্দ্রনাথের এই চিন্তাই তাঁর লোক সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধে উচ্চারিত হয়েছে। তাঁর পরিচিত জনের মধ্যে যাঁরা সাহিত্যমনস্ক ছিলেন, তাঁরা উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন এবং লোককথা

সংক্রান্ত সমস্ত রকম সাহিত্য রচনায় উদ্যোগ নিয়েছিলেন। এর ফল স্বরূপ ১৩০২ থেকে পরপর প্রকাশিত হতে থাকে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'শকুন্তলা', 'ক্ষীরের পুতুল'; অঘোরনাথের 'মেয়েলি-ব্রত'; যোগীন্দ্রনাথ সরকারের 'খুকুমণির ছড়া', দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের, 'ঠাকুরমার ঝুলি'; উপেন্দ্রকিশোরের 'টুনটুনির বই' আরো কত কী। ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে অবনীন্দ্রনাথের 'বাংলার ব্রত' প্রকাশিত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য 'ক্ষীরের পুতুল'-এর মূল কাহিনীটি মৃণালিনী দেবীর সংগ্রহ থেকে গৃহীত। তিনিও রবীন্দ্রনাথের উৎসাহে উপকথা ও চলিত লোককথা সংগ্রহে ব্রতী হয়েছিলেন। বোঝাই যায়, সে সময় রবীন্দ্রনাথের প্রেরণায় বাংলা দেশে লোকসাহিত্য সঙ্কলনের একটি জোয়ার এসেছিল। এর গুরুত্ব ও আবশ্যিকতা নিরূপণ করেছেন পণ্ডিতেরা। লোকসাহিত্য ও শিল্পের অন্যতম আকর হল ব্রতকথা। কবি আকৃষ্ট হয়েছিলেন এর ছন্দে ও সুরে তথা লিরিকে। নিতান্ত গদ্যময় প্রাত্যহিক দীনতার কথাও যখন ছবিতে গানেতে প্রকাশ পায়, তখন তা পূর্ণ হয়ে ওঠে অনির্বচনীয়ের মাধুর্যে। এইজন্যই রবীন্দ্রনাথ 'ব্রত সংগ্রহের' উপর বিশেষ জোর দিয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা সংবলিত এই 'মেয়েলি ব্রত' বইটি 'সুর এন্ড কোম্পানী' প্রকাশ করেন বাংলার ১৩০৩ সালে। মূল্য চার আনা। রা'ল দুর্গা, মঙ্গলচণ্ডী, সাঁজপূজনী, দশপুত্তল, হরি'চরণ, ইন্দ্রপূজা, তোষলা, পুণ্যিপুকুর, যমপুকুর, গোকল, অশ্বত্থপাতা, শিব ও পৃথিবী ব্রতর কথা সঙ্কলিত এই বইয়ের অলঙ্করণ করেছিলেন দীনেন্দ্রকুমার রায়। লেখক বলছেন, "হুগলি, বর্দ্ধমান ও বীরভূম প্রভৃতি পশ্চিমবঙ্গ প্রচলিত ক একটী মেয়েলি ব্রতের বিবরণ এই গ্রন্থে সঙ্কলিত হইল।" দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশের ইচ্ছার কথাও অঘোরনাথ জানিয়েছিলেন; দেখা গেছে বই প্রকাশের পরেও 'ভারতী' পত্রিকায় তিনি ব্রতকথা সম্বন্ধে লিখছেন। কিন্তু তা পুস্তক আকারে প্রকাশ পেয়েছে— এমন সন্ধান পাওয়া যায়নি। এখানে দু-একটি কথা বলা আবশ্যক। ১৩৩৯ সালে অঘোরনাথের মৃত্যুর পর 'প্রবাসী'র চৈত্র সংখ্যায় 'বিবিধ প্রসঙ্গ শিরোনামে সম্পাদক লিখেছেন— "নলহাটী নিবাসী শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ৭১ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। ধর্ম্মবন্ধু, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ভারতী, নব্যভারত, সাধনা, দাসী, প্রদীপ, প্রবাসী, বঙ্গদর্শন (নবপর্য্যায়), সজ্জনতোষিণী, জ্যোতিঃ প্রভৃতি মাসিকপত্রে ইঁহার অনেক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল।

মেয়েলি ব্রত।

(স্ত্রীসমাজে প্রচলিত কতিপয় বারব্রতের বিবরণ।)

'ভক্তচরিতামৃত' ও 'শ্রীহরিদাস ঠাকুর' প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা

শ্রীঅঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়

সঙ্কলিত।

কলিকাতা,

১৪ নং ডফ্ ষ্ট্রীট হইতে

সুর এণ্ড কোম্পানী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

১৩০৩।
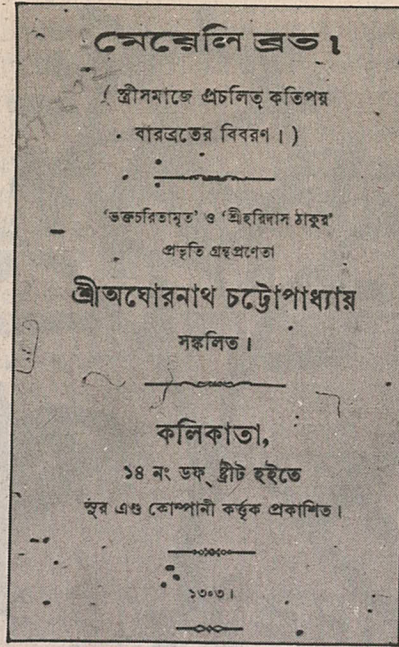
'মেয়েলি ব্রত' গ্রন্থের আখ্যাপত্র

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ইঁহাকে শান্তিনিকেতনের তত্ত্বাবধায়ক ও আচার্য্যপদে নিযুক্ত করেন। তখন সেখানে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। রবীন্দ্রনাথের উপদেশ অনুসারে তিনি 'মেয়েলি ব্রত' নামক পুস্তক প্রকাশ করেন।"

অঘোরনাথের ব্যক্তিগত খাতাপত্র ও দিনলিপি থেকে ব্রত ও প্রবচনের প্রতি যে তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল তা জানা যায়। এর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের উৎসাহ ও সহায়তা তাঁকে এই সংগ্রহের কাজে বা পরে তা বই আকারে প্রকাশে উদ্যোগী করে। নিজের কাজে তাঁকে গ্রামে গঞ্জে ঘুরতে হত, তাই এই সংগ্রহের কাজটি তাঁর পক্ষে সহজ হয়েছিল। এই বইয়ের অনেকগুলি ব্রতকথাই ১৩০১ সাল থেকে 'সাধনা'য় প্রকাশিত হয়। পরে তা বই আকারে যখন প্রকাশ পায়, রবীন্দ্রনাথ বইয়ের ভূমিকাটি পত্রাকারে কার্সিয়ং থেকে পেনসিলে লিখে পাঠান এবং সেটি 'copy' করে ছাপতে দিতে নির্দেশ দেন। দেখা গেছে রবীন্দ্রনাথ ভুলবশত 'আশ্বিন' লিখেছেন এবং চিঠির উপরেই অঘোরনাথ সংশোধন করে 'কার্তিক' লিখেছেন। ভূমিকাটি এইরকম :

'সাধনা পত্রিকা সম্পাদনকালে আমি ছেলে ভুলাইবার ছড়া এবং মেয়েলি ব্রত, সংগ্রহ ও প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত ছিলাম। ব্রতকথা সংগ্রহে অঘোরবাবু আমার প্রধান সহায় ছিলেন। সেজন্য আমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ আছি। — অনেকের নিকট এই সকল ব্রতকথা ও ছড়া নিতান্ত তুচ্ছ ও হাস্যকর বলিয়া মনে হয়। তাঁহারা গম্ভীর প্রকৃতির লোক এবং এরূপ দুঃসহ গাম্ভীর্য্য বর্ত্তমানকালে বঙ্গসমাজে অতিশয় সুলভ হইয়াছে।

'বালকদিগের এমন একটি বয়স আসে যখন তাহারা বাল্য সম্পর্কীয় সকল প্রকার বিষয়কেই অবজ্ঞার চক্ষে দেখে অথচ পরিণত বয়সোচিত কার্য্যসকলও তাহাদের পক্ষে স্বাভাবিক হয় না। তখন তাহারা সর্ব্বদা ভয়ে ভয়ে থাকে পাছে কোন সূত্রে কেহ তাহাদিগকে বালক মনে করে। বঙ্গ সমাজের গম্ভীর সম্প্রদায়েরও সেই দুর্গতি উপস্থিত হইয়াছে। তাঁহারা বঙ্গভাষা, বঙ্গসাহিত্য, বঙ্গদেশ প্রচলিত সর্ব্বপ্রকার ব্যাপারের প্রতি অবজ্ঞামিশ্রিত কৃপাকটাক্ষপাত করিয়া আপন প্রকৃতির অতলস্পর্শ গাম্ভীর্য্য এবং পরিণতির প্রমাণ দিতে প্রয়াস পাইয়া থাকেন। অথচ তাঁহারা আপন অভ্রভেদী মহিমার উপযোগী আর যে কিছু মহৎকীর্ত্তি রাখিয়া যাইবেন এমন কোন লক্ষণও প্রকাশ পাইতেছে না।

'য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ দর্শন বিজ্ঞান ইতিহাসে যথেষ্ট মনোযোগ করিয়া থাকেন এবং ছড়া রূপকথা প্রভৃতি সংগ্রহেও সঙ্কোচ বোধ করেন না। তাঁহাদের এ আশঙ্কা নাই পাছে লোক-সাধারণের নিকট তাঁহাদের মর্য্যাদা নষ্ট হয়। প্রথমতঃ তাঁহারা জানেন যে, যে সকল কথা ও গাথা সমাজের অন্তঃপুরের মধ্যে চিরকাল স্থান পাইয়া আসিয়াছে তাহারা দর্শন, বিজ্ঞান ও ইতিহাসের মূল্যবান উপকরণ না হইয়া যায় না— দ্বিতীয়তঃ যাহারা স্বদেশকে অন্তরের সহিত ভালবাসে তাহারা স্বদেশের সহিত সর্ব্বতোভাবে অন্তরঙ্গরূপে পরিচিত হইতে চাহে এবং ছড়া রূপকথা ব্রতকথা প্রভৃতি ব্যতিরেকে সেই পরিচয় কখনো সম্পূর্ণতা লাভ করে না।

'সাধনায় যখন আমি এগুলি সংগ্রহ ও প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম তখন আমার কোন প্রকার মহৎ উদ্দেশ্য ছিল না। সমাজের সুধাভাণ্ডার যে অন্তঃপুর, তাহারই প্রতি স্বাভাবিক মমত্ববশতঃ আকৃষ্ট হইয়া আমাদের মাতা মাতামহী আমাদের স্ত্রী কন্যা সহোদরাদের কোমল হৃদয় পালিত মধুর কণ্ঠ লালিত চিরন্তন কথাগুলিকে স্থায়ীভাবে একত্র করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম এবং অঘোরবাবুকে এই সমস্ত মেয়েলি ব্রত গ্রন্থ আকারে রক্ষা করিতে উৎসাহী করিয়াছি, সে জন্য গম্ভীর প্রকৃতি পাঠকদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। এবং সেই সঙ্গে একথাও বলিয়া রাখি যে, এই সকল সংগ্রহের দ্বারা ভবিষ্যতে যে কোন প্রকার গম্ভীর উদ্দেশ্য সাধিত হইবে না এমনও মনে করি না।

'এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত বাবু দীনেন্দ্রকুমার রায় মহাশয়ের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি। তিনি

বঙ্গদেশের জনসাধারণ প্রচলিত পার্বণগুলির উজ্জ্বল এবং সুন্দর চিত্র সাধনায় প্রকাশ করিয়া সাধনা সম্পাদকের প্রিয় উদ্দেশ্য সাধনে সহায়তা করিয়াছেন। সে চিত্রগুলি বঙ্গসাহিত্যে স্থায়ীভাবে রক্ষা করিবার যোগ্য এবং আশা করি দীনেন্দ্রকুমার বাবু সেগুলি গ্রন্থ আকারে প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না।'

শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ 'বাংলার ব্রত' নামে যে-বইটি লেখেন, সেটি পরে ১৩৫০ সালে 'বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ গ্রন্থমালা'য় যুক্ত হয়। তাঁর লেখায় ব্রতের বিবরণের সঙ্গে সঙ্গে আলপনা এবং বিশেষত লোকশিল্প সম্বন্ধে আলোচনা মূল্যবান নথি বলে মনে করা যেতে পারে। হয়তো সন্ধান করলে দেখা যাবে, তাঁর সংগ্রহে যে মোটিফগুলি (motif) রক্ষিত আছে, সমাজের রীতিনীতি বদলের সঙ্গে সেগুলির মূল উৎস কোথায় হারিয়ে গেছে। ব্রত পালনে ছবির আয়োজন, ব্যবহার ও ব্রতানুষ্ঠানে তার ভূমিকা সম্বন্ধে তিনি বিশদ আলোচনা করেছেন। এমন কী 'নিবেদন'-এ বলেছেন যে তিনি নিজে এবং ছাত্ররা মিলে যে আলপনা, মণ্ডন চিত্র সংগ্রহ করেছেন, তা সঙ্কলিত করেছেন এই ব্রতর বইটিতে।

অঘোরনাথের সঙ্কলিত ব্রত কথাটির আলোচনা করলে দেখা যায়, এখানে দু'ধরনের ব্রত আছে। এক, শাস্ত্রীয় — যেমন হরি'চরণ ব্রত, সাবিত্রীব্রত, অনন্তব্রত, গোকলব্রত ইত্যাদি। এগুলির শ্লোক বা মন্ত্রের অনেকটা অংশই সংস্কৃতে রচিত এবং ব্রতের নিয়ম শাস্ত্র অনুসারী। দুই, লৌকিক— সাঁজপুজনী, পুণ্যিপুকুর, অশ্বত্থপাতার ব্রত— অশাস্ত্রীয় বা খাঁটি মেয়েলি ব্রত। মেয়েলি ব্রত সম্পর্কে এই বইটিতে লেখা হয়েছে, "সমগ্র হিন্দুপারাবার মন্থন করিলেও এগুলির অনুকূলে অনুষ্টুভ ছন্দে রচিত একটীও শ্লোক উদ্ধার করিতে পারা যায় না।

"অথচ আমাদের রমণীসমাজে এই ব্রতগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সম্পন্ন হইয়া থাকে। আমরা এইগুলিকেই 'মেয়েলি ব্রত' নামে অভিহিত করিয়াছি। সমুদায় ব্রতানুষ্ঠানে ব্রতকথা শুনিবার নিয়ম আছে। শাস্ত্রীয় ব্রতগুলির ব্রতকথা সংস্কৃতভাষায় লিখিত সুতরাং পল্লিবাসিনী ব্রতচারিণীকে বর্ণজ্ঞানশূন্য পুরোহিতের মুখে অশুদ্ধ ও অবোধ্য মন্ত্রগুলি কেবল নীরবে কর্ণস্থ করিয়া সন্তুষ্ট হইতে হয়। কিন্তু মেয়েলি ব্রতের কথাগুলি মেয়েলি ভাষায়, মেয়েলি ছড়াতে মেয়েলি ভঙ্গীতে রচিত। ইহার শ্রোতা বক্তা সমস্তই স্ত্রীলোক। কোন প্রবীণা রমণী এই ছড়া ও কথাগুলি আনন্দ এবং উচ্ছ্বাসের সঙ্গে যখন বর্ণনা করেন তখন, শ্রোতৃমণ্ডলী শ্রদ্ধাপূর্ণচিত্তে তাহা শ্রবণ করিয়া

ওঁ

নমস্কারাঃ সন্তু

তোমার ইন্দ্রপ্রস্থ এবং
মেয়েলি ব্রত আমাদের সকলেরই
এবং পাঠক সাধারণের ভাল
লেগেছে। মেয়েলি ব্রত অনেক-
গুলি আমার লেখার মধ্যে স্থান
পেয়েছে। অন্যান্য ব্রতকথা
যত পার সংগ্রহ করে পাঠিয়ে
দিয়ো। বোলপুরে স্বাস্থ্যের
অবস্থা কি রকম। আমি প্রায়
দিন কুড়িক থেকে নানা কাজে
এত ব্যস্ত ছিলুম যে তোমার
মাসিক বেতনের প্রস্তাব সম্পূর্ণ
বিস্মৃত হইয়াছিলাম। যদি
১০।১২ টাকায় উক্ত কাজ নিষ্পন্ন
হয়, তবে বিলম্ব করিবার আব-
শ্যক নাই। ইতি

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অঘোরনাথকে লেখা এ যাবৎ অপ্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের সেই চিঠি

থাকেন।” মেয়েদের, বিশেষত গ্রামাঞ্চলে একত্রে আনন্দ করাটাই বোধকরি ব্রতের গোড়াকার কথা।

এ প্রসঙ্গে বলি, গত দু তিন দশক ধরে, মূলত পশ্চিমী প্রভাবে, আমাদের দেশে মেয়েদের সম্বন্ধে চিন্তা, আলোচনা এবং গঠনমূলক কাজের প্রচেষ্টা চলেছে। কোথাও বা তা সভা-সমিতির আকারে, আবার কোথাও বা তা আন্দোলনের মাধ্যমে। উদ্দেশ্য একটাই— মেয়েদের সম্বন্ধে প্রধানত মেয়েরাই এবং আরো যাঁরা সচেতন মানুষ তাঁরা নতুন করে 'পারিবারিক ও সামাজিক স্তরে নারীর ভূমিকা' এবং বিশেষত 'নারীমুক্তি' বিষয়ে ভাবছেন। অবশ্যই এ দুটি বিষয় অনেকটাই নির্ভর করে স্ত্রী-শিক্ষা ও সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোর উপর। তবে, এই যে ভাবনা এবং খোলা মনে দেখার ইচ্ছা ও চেষ্টা এটা কম কথা নয়। ঠিক এমনই সময়ে, একশো বছর আগে প্রকাশিত বইটির আলোচনা হয়ত অপ্রাসঙ্গিক হবে না। এখানে একজন সংবেদনশীল মানুষ এই ব্রত বিবরণের মধ্যে দিয়ে গ্রামের মেয়েদের জীবনের একটা দিক ধরতে চেষ্টা করেছেন। এখন একথা মনে হতেই পারে যে, ব্রতকথার সঙ্গে আজকের নারী- স্বাধীনতা বা ভাবনার যোগটি কোথায়! ঠিক সরাসরি না হলেও, একটা যোগ যে রয়েছে তা স্পষ্ট। কেননা নারী এই ব্রতানুষ্ঠানের মধ্যেই কাব্যে, গীতে, চিত্রে, তার স্বাধীনতা বা তার আবেগ বারেবারে প্রকাশ করেছে। ব্রত পালনের প্রথম যুগে যদিও নারীমুক্তির চিন্তাটি স্পষ্ট বা প্রকট ছিল না, তবু তখনও তার আবেগ ছিল, নিজেকে প্রকাশের ইচ্ছা ছিল, তারই পরিচয় ব্রতের অনুষ্ঠানে।

এবার ব্রতর সূচনাকাল সম্বন্ধে একটা ধারণা করা প্রয়োজন। সম্ভবত পুরাণেরও আগে বৈদিক যুগের একেবারে গোড়ার দিকে এবং তারও আগে, যখন হিন্দু ধর্মের অস্তিত্বও খুব পরিষ্কার হয়ে ওঠেনি, ব্রত তখনকার অনুষ্ঠান। বিশেষত অশাস্ত্রীয় বা খাঁটি মেয়েলি ব্রতগুলি লক্ষ করলে দেখা যাবে, ব্রত, প্রকৃত অর্থে গোষ্ঠীর পূজা, ব্যক্তির নয়। অর্থাৎ ব্যক্তির প্রভাব তখনও গোষ্ঠীকে ছাড়িয়ে যায়নি। এর মধ্যে যদিও (এখন যে অবস্থায় ব্রতকথা পাওয়া যায়) নিজের নিরাপত্তার কথা বলা হচ্ছে, তবুও প্রধান উদ্দেশ্য কিন্তু প্রকৃতির কাছে মানুষের কামনা। তার প্রতিদিনের, এমন কি, সারা বছরের কামনা এই ব্রতগুলিতে সংহত হয়েছে। তবে একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে আশ্চর্য হই এই ভেবে, যে, কেন 'শস্পাতা' বা 'করম্' ব্রতে শস্যের 'কল্' বেরোনো দেখার জন্য এই ভাদ্রের মাঝামাঝি থেকে সংক্রান্তির সময়টিই রাখা হয়েছে! এ কি অ-চিন্তিত? নাকি ধরে নিতে পারি যে, তখনও বৈজ্ঞানিক জিজ্ঞাসার বা কার্যকারণের মধ্যেকার সম্পর্কটি সম্বন্ধে মানুষের জানা ছিল না। সেইজন্যই তারা যুক্তি দিয়ে তাদের সংজ্ঞা বা ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি। অবশ্য এর সঙ্গে 'অসহায়ে'র ভক্তিবাদও ছিল; বিশ্বাস করতে পারার মধ্যে আসলে এক ধরনের নির্ভরতা আছে। তবে বাতাসের আর্দ্রতা যে ওই বিশেষ সময়ে কল্ বেরোনোর সহায়ক, সে তারা অভিজ্ঞতা থেকে হয়তো বুঝত। আবার দেখি পুণ্যিপুকুর— সেটি হল জল কামনায় বৈশাখের ব্রত। আজ তো আমরা সকলেই জানি যে কুয়ো বা পুকুর খোঁড়ার প্রশস্ত সময় গ্রীষ্মই; এ কি তারই অভিনয় নয়! অবশ্য ক্রমে শাস্ত্রকারদের হাতে পড়ে সমাজের বদলের সঙ্গেসঙ্গে ব্রতের খাঁটি রূপটিও বদল হয়ে চলেছে।

অঘোরনাথ যে সময় লিখছেন, তখনও বাংলার গ্রামে প্রাত্যহিকীর অনেকখানি জুড়ে ছিল ধর্ম। 'ধর্ম' বলতে তাত্ত্বিকেরা বা কট্টরপন্থীরা যা বোঝেন, তা নয়, তার থেকে খানিকটা আলাদা রকম। হয়তো এ কথা বলা যেতে পারে, ধর্মের 'আটনের' উপরেই মেয়েদের সংসারটি বসানো ছিল। পায়ে পায়ে ভয় ছিল, কার শাপ, কার পাপ, কার তাপ, কাকে ছোঁয়! এই ব্রত পালনের আশ্রয়ে প্রায় নিরক্ষর মেয়েরা স্বামী-সন্তানের কল্যাণকামনা, সতীন-কণ্টকিত সংসারে অসংশয়িত নিরাপত্তার আশ্বাস ও সর্বোপরি আনন্দের আস্বাদ পেত। শুধু তাই-ই নয়, এই অনুষ্ঠানের মধ্যে সামাজিক বাধানিষেধ, শালীনতা রক্ষা ইত্যাদিও অনেকটা শিথিল করার সুযোগ ছিল। সবচেয়ে বড় কথা, "খাঁটি মেয়েলি ব্রতগুলি ঠিক কোনো দেবতার পুজো নয়; এর মধ্যে ধর্মাচরণ কতক, কতক উৎসব।" [অবনীন্দ্রনাথ] —এর মধ্যে আমরা পাই কিছু ছবি, কিছু গান, কিছু নাটক, কিছু কাব্য। সত্যিই একে শুধু ধর্মপালন বলা ঠিক হবে না, কেননা এ তো ঋতুরও উৎসব। মানুষ, গাছপালায়, সমস্ত বিশ্ব প্রকৃতিকে মিলিয়ে উৎসব। তাই তো দেখি বৈশাখে জল-কামনায় পুণ্যিপুকুর, ভাদ্রে শস্পাতা বা শস্যপাতা (ইন্দ্রপূজা), পৌষে তোষলা— তুষ ইত্যাদি সারমাটি, সরষে-মুলো- শিমের ফুল দিয়ে; আবার চৈত্র মাসে অশ্বত্থ পাতার ব্রত— যখন গাছ তার শেষ শুকনো পাতাটি খসিয়ে নতুন কচি পাতায় নব কলেবর ধারণ করে। গাছের কিশলয়টির সঙ্গে তলায় পড়ে ~~থড়ে~~ থাকা ঝুরো পাতাটির যে-সম্পর্ক, এই ব্রতে যেন তারই ইঙ্গিত। অন্য আরেকটি কারণে বেদ-উত্তর পর্বেও এ ব্রতটি টিকে গেছে— অশ্বত্থ গাছের শুকনো ডাল বা কাঠ থেকে 'অরণি' তৈরি করা হত। সেইজন্যই বোধ করি আজও গ্রামাঞ্চলে অশ্বত্থ গাছ কাটা বিধেয় নয়।

ব্রতের আরম্ভ থেকে তার উদযাপনের মধ্যে যে আয়োজন ও পালনের অংশ, তার মধ্যেই কিন্তু ব্রতের চরিতার্থতা। আসলে মেয়েরা তাদের ইচ্ছটি হাতের আলাপনায়, গলার সুরে, নাচে, নাট্যে, ভাবে ফুটিয়ে তুলছে, এবং এটিই ব্রতের নিটোল নিখুঁত রূপ। বৈদিক দেবতা সূর্য ইন্দ্র উষা নদ-নদী এদের সকলের কথাই মেয়েলি ব্রতে পাওয়া যায়। বেদের প্রভাব নিশ্চয়ই রয়েছে, তবে বেদ থেকেই যে এই ব্রতের উৎপত্তি, সেটা হয়তো বলা যাবে না; কেননা আদিম মানুষের মধ্যেও মাটি, জল, আলো, বাতাসের পুজো ছিল। আদিতে প্রাকৃতিক শক্তির ভয়াবহতা থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় মানুষ পুজো করা শুরু করেছিল এবং সেই 'শক্তি'রাই আদিম দেবতা, যাদের পরে, লৌকিক বা অনার্য দেবতা বলা হয়েছে। এই ব্রত-র কথা-য় আর্য দেবতারা ধীরে ধীরে অনার্য দেবতাদের সঙ্গে স্থান করে নিয়েছেন। যেমন শস্পাতা ব্রতে— এই ব্রতের অন্য নাম 'ইন্দ্রপূজা'। লক্ষ করা যেতে পারে 'ব্রত'-র পরিবর্তে এটিতে 'পূজা' শব্দটি ব্যবহৃত হচ্ছে। মনে হয় পরবর্তী কালে এই শস্পাতা ব্রত বৃষ্টির বৈদিক দেবতা ইন্দ্রকে তুষ্ট করার জন্য 'ইন্দ্রপূজা' নাম ধারণ করেছে। একটি মজার ব্যাপার হল, আজও, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, পুরুলিয়া, মানভূম অঞ্চলের সাঁওতালদের মধ্যে অনুরূপ একটি ব্রত-র প্রচলন আছে। ব্রতানুষ্ঠানে কিছু তফাৎ থাকলেও মূল ব্রতটি এক এবং ইঁদপূজা [ইন্দ্র] নামটিও প্রচলিত। উৎসবের নাম 'করম্'। উভয় ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য একই— শস্যকামনায় মিলিত হয়ে উৎসব। প্রসঙ্গত বলে রাখা ভাল [শসপাতা তথা ভাঁজো-র] 'নাচগানের এই ভঙ্গির সঙ্গে সাঁওতালী নৃত্যের সাদৃশ্য আছে।' [বিনয় ঘোষ] ইন্দ্রের আঞ্চলিক নাম 'ভাঁজো' সম্ভবত 'ভজনা' শব্দের অপভ্রংশ। 'শস্পাতা' ও 'করম্' ব্রতের মধ্যে যে সাদৃশ্য তা হয়তো শস্পাতা ব্রতের প্রাচীনত্ব প্রমাণে সহায়ক।

এই সংকলনের প্রথম ব্রতটির নাম রা'ল দুর্গা বা পূর্ণিমার ব্রত। দ্বিতীয় অংশটির নামকরণের কারণ বোঝা সহজ; পূর্ণিমায় উদ্‌যাপন করা হয় বলেই এই নাম। কিন্তু প্রথম অংশটি আমাদের ভাবায় এই ব্রতে একই সঙ্গে হর-গৌরী ও রা'ল তথা রাউল বা সূর্যের আরাধনা করা হচ্ছে। কিন্তু কেন?— এবার 'কথা'র আরম্ভের মন্ত্রটি দেখা যাক।—

"নমঃ নমঃ সদাশিব তুমি প্রাণেশ্বর।

ভক্তিবাহনে প্রভু দেব দিবাকর।
হরগৌরীর চরণে করিয়া নমস্কার।
যাহার প্রচারে হল দেবীর প্রচার।
শুন সবে সর্বলোক হয়ে হরষিত।
বড়ই আশ্চর্য কথা সূর্যের চরিত।...”

কৈলাস পর্বতে হর-পার্বতীর পাশা খেলা দিয়ে এই ব্রতে কাহিনীর শুরু। শিবের কোপানল থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য পার্বতী ব্রাহ্মণকে উপদেশ দিচ্ছেন সূর্যের আরাধনা করতে। কিন্তু সূর্যপূজার মধ্যে বারেবারেই হর-গৌরীর কথা আসছে। হর-গৌরী লৌকিক দেবতা। বিশেষত বাঙালির মনে এদের চিরন্তন রূপটি হল প্রবাসী কন্যা-জামাতার, অতি নিকটজনের। কিন্তু সূর্যের কথা ভিন্ন। আলোর ব্যাপ্তির মতই তার অলৌকিকত্ব তথা শক্তি। সূর্যের মাহাত্ম্য প্রমাণের পরিচয়ই যেন এই ব্রতে। তা ছাড়া লৌকিক দেবতা শিবের তুলনায় বৈদিক দেবতার পরাক্রম বেশি— এর ইঙ্গিতও আমরা পাই। ব্রতকথাটি পড়তে পড়তে, বারে বারে মনে হয় যে 'সূর্যের কথা অংশটি পরবর্তী কালের সংযোজন।

আবার শস্পাতার ব্রতের প্রসঙ্গে আসি। ভাদ্র মাসে মন্থন ষষ্ঠীর আগের দিন পঞ্চমী তিথিতে একটি সরায় পাঁচ শস্য— মুগ, মটর, অড়হর, কলাই ও ছোলা ভিজিয়ে রেখে পরদিন থেকে সরষে ও ইঁদুরমাটি মিশিয়ে রোজ ভোরে জল দিয়ে রাখতে হয়। শুক্ল তথা ইন্দ্রদ্বাদশীতে এই ব্রত শেষ হয় 'নিদ্‌ভাঙা' বা 'জাগরী' দিয়ে। শেষ দিনে মেয়েরা কোনও একটি বাড়ির ভিতরের উঠোনে বা বারান্দায় ইন্দ্রের জন্য একটি বেদী তৈরি করে তাতে মূর্তি গড়ে বা মূর্তি না রেখেও ইন্দ্রের প্রতীকী বজ্র, হস্তী ইত্যাদির আলপনা এঁকে সাজায়। এর পর আপন আপন সরা, যা তারা এ-কদিন ধরে সযত্নে রক্ষা করেছে, তা বেদীর সামনে রেখে পুরোহিতের সংস্কৃত মন্ত্রোচ্চারণের জন্য অপেক্ষা করে। পুরোহিতের কাজ সারা হলে তারা একত্রে হাত ধরাধরি করে বেদীকে ঘিরে প্রথমেই বলে :—

“ভাঁজো লো কল্‌কলানী, মাটির লো সরা
ভাঁজোর গলায় দেব আমরা পঞ্চফুলের মালা
এক কল্‌সি গঙ্গাজল, এক কল্‌সি ঘি
বৎসরান্তে একবার ভাঁজো, নাচব না তো কি।”

লেখক বলছেন, পুরোহিতের বিদায়ের পরই শুরু হয় “প্রধান সাধন, সঙ্গীত ও নৃত্য।” —সাধারণত ৭/৮ থেকে ২০/২৫ বছর বয়সী সমস্ত মেয়েই এই ব্রতের অধিকারী। সৌভাগ্যক্রমে লেখক তাঁর বালক বয়সে এই উৎসবে উপস্থিত থাকার সুযোগ পেয়েছিলেন। তিনি লিখছেন, “রজনী প্রহরাতীত হইলে শরজ্জোৎস্নায় চারিদিক যখন আনন্দে এবং আলোকে হাস্য করিতে থাকে, সেই হাস্যময়ী জ্যোৎস্নাবতী রাত্রিতে বালিকা এবং যুবতীগণ মনোহর বস্ত্রালঙ্কারে সজ্জিত হইয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করেন। তখন অন্তঃপুরের দ্বার দৃঢ়রূপে বন্ধ করা হয়। এ সময় কোন পুরুষ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে পারেন না। কেবল বাদ্যকর বেদি হইতে কিঞ্চিৎ দূরে পর্দার অন্তরালে বসিয়া বাদ্য বাজাইতে থাকে। ... স্বর্গে সুরপুরে দেবরাজ পুরন্দরের সভায় দেবগণের সন্তোষ বিধানার্থ অপ্সরাগণ নৃত্য ও সঙ্গীত করেন, ... বোধহয় এই 'স্বর্গীয়' প্রথার অনুকরণে শস্য ও বৃষ্টি কামনায় ইন্দ্রপূজার বিধি প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকিবে।” — যে বছর শস্যের 'কল্' ভাল বের হয়, মনে করা হয় সে বছর ফসল ভাল ফলবে। এ ব্রতের মন্ত্রোচ্চারণ পর্বটি বোধ হয় বেদ-উত্তর পর্বে সংযোজন।

অঘোরনাথের ব্যক্তিগত খাতাপত্র ও দিনলিপি থেকে ব্রত ও প্রবচনের প্রতি যে তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল তা জানা যায়। এর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের উৎসাহ ও সহায়তা তাঁকে এই সংগ্রহের কাজে উদ্যোগী করে।

●

এই ব্রতগুলির সাহিত্যিক ও শিল্পরসও বিশেষ ভাবে লক্ষ করার মতো। ব্রতের অনুষ্ঠান পদ্ধতিতে “কেবল চাল কলা মিষ্টান্ন ও বিশুদ্ধ গব্যরসের উল্লেখ আছে,” তা নয়, এর মধ্যে সমাজের নানা অভিজ্ঞতা এবং আমাদের ভাষার 'শৈশব ইতিহাস'ও ধরা আছে। অঘোরনাথ 'প্রস্তাবনা' পর্বে বলছেন— “সাহিত্যের দুইটি স্তর আছে, উচ্চ ও নিম্ন; অর্থাৎ শিক্ষিত সমাজের সাহিত্য ও অশিক্ষিত সমাজের সাহিত্য। আমাদের নারীসমাজ সাধারণত বর্ণজ্ঞানশূন্য। এই নিরক্ষর নারীসমাজে বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রকৃতি কিরূপ তাহা অবগত হইতে হইলে মেয়েলি ছড়া ও মেয়েলি আখ্যায়িকা প্রভৃতির আলোচনা একান্ত আবশ্যক। এই উদ্দেশ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত-পূর্ব্বক ছড়াগুলি কিছুমাত্র সংশোধিত না করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছি।” —ব্রতের শ্লোকগুলিতে সবসময় অন্তঃমিল দেখা যায় না। মার্জিত ভাষাও সময়ে সময়ে ব্যবহৃত হয় না; আবার কখনও চলিত কথাবার্তার মতো হয়। সেগুলিকে ছড়া না বলে নাটকও বলা যেতে পারে। অনেক সময় এই ছড়া কাটাকাটি অভিনয়ের মতোই অনুষ্ঠিত হত। শ্রুতি পরম্পরায় চলে আসা ছড়াগুলি ভাবের আবেশে এবং বিশ্বাসের জোরে আবৃত্তিকালে আপনা থেকেই ছন্দোময় ও নাটকীয় হয়ে ওঠে। যেমন অশ্বত্থপাতার ব্রতে—

“শ্যাম পাণ্ডবের ঝি, স্বাকারা সুন্দরী ॥
সাত বৌ যায় সাত দোলাতে
সাত বেটা সাত ঘোড়াতে
কর্তা যান গজহস্তীতে
গিন্নী যান রত্নসিংহাসনে ॥
সেই দিক দিয়ে ভগবতী যাচ্চেন।
ভগবতী বো'লচেন ;—
মা গো মা! তোমরা কি ব্রত কর্চ্চ ?
এই ব্রত কর্ল্লে কি হয় ?”

এরপর আরও আছে। কিন্তু এই প্রথম অংশটুকু অনেক সময় একে অন্যের সঙ্গে কথোপকথনের মতো বলে। (পাঠান্তর : ভগবতীর বদলে ঠাকুর ও ঠাকুরুন)। আবার তোষলা ব্রতে দেখি বিশেষ শব্দ ব্যবহার—

“তোষলা লো তুষকুন্নি/ ধনে ধানে গাইগুষ্টি ॥
(পাঠান্তর : ঘরে ঘরে গাই বিউন্তি ॥)

ছড়ার মধ্যে দেশজ শব্দ ও ভাবের ব্যবহার লক্ষণীয়। বর্তমানে গ্রামাঞ্চলেও হয়তো এসব শব্দের তেমন আর প্রচলন নেই। যেমন চৈত্র মাসের 'কালা পুষ্প' —জলজ সুগন্ধী ফুল। মহাবিষুব সংক্রান্তিতে শিবপুজোর জন্য এ ফুল একসময় অবশ্য প্রয়োজন ছিল। কিন্তু আজ অনেকেই জানেন না প্রকৃত অর্থে এখানে কোন্ ফুলের কথা বলা হচ্ছে। 'তোষলা'র আয়োজন : অগ্রহায়ণ মাসের সংক্রান্তির দিন সকালে স্নান করে একটি কালো দাগ-হীন নতুন সরাতে বেগুনপাতা বিছিয়ে গোবরের একুশটি গুলি করে রাখতে হয়। প্রত্যেকটিতে একটি করে সিঁদুরের ফোঁটা দিয়ে নতুন আতপের তুষ ও কুঁড়ো দিয়ে আবার একটি বেগুনপাতা ঢাকা

দিতে হয়। সরষে, মুলো ও শিমের ফুল দিয়ে পুজো হয়। যার ব্রত সে নিজেই পুরোহিত। পৌষসংক্রান্তির দিন ভোরবেলা ঘিয়ের প্রদীপ জ্বালিয়ে সরাখানি জলে ভাসাতে যেতে হয়, তার মন্ত্র হল—

"কুল্‌কুলনী এয়ো রাণী
মাঘ মাসে শীতল পানি।"— ইত্যাদি।

এটির মধ্যে শীতের কাক-ভোরে কুয়াশা মাখা গ্রামের একটি অমলিন ছবি আমরা দেখতে পাই। কিন্তু এর সঙ্গে বাল্যবিবাহ-বিরোধী অঘোরনাথ আরও কিছু দেখেছিলেন।

—"স্বামিগৃহে গমন করিয়া রন্ধনশালায় প্রবেশ করিলে (বালিকাকে) তুষ ও গোময়খণ্ডের ধূমে যেন ক্লেশ ভোগ করিতে না হয়, এই উদ্দেশ্যেই বোধহয় গোময় ও তুষের পূজা প্রচলিত হইয়াছে।" আসলে একমাত্র কুমারী বালিকারাই এই ব্রতের অধিকারিণী।

সমস্ত বইটি জুড়ে প্রবন্ধকার মাঝে-মাঝেই নিজ মতামত প্রকাশ করেছেন। তাঁর সরস মন্তব্যে ব্রতকথায় একটি নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছে। ধরা যাক— ইন্দ্রপুজার বিসর্জনের মন্ত্রটির কথা—"ভাঁজো, এই পথে যেও।/ বেণাগাছে কড়ি আছে/দুধ কিনে খেও।"

এখানে লেখকের মন্তব্য, "আবশ্যক অতীত হইয়া গেলে মানুষ উপকারী সুহৃদকে এইরূপ মিথ্যা প্রবঞ্চনায় ভুলাইয়া দিবার জন্য ব্যস্ত হয়। বেণা গাছে কড়ি নাই, তাহাতে দুধও মিলিবে না— কিন্তু ওটা বোধ করি ভদ্র করিয়া বলা যে এখন তুমি নিজের পথ নিজে দেখ, এবং দুধ খাইবার আবশ্যক বোধ কর তো কড়ির সন্ধান করো গে।" অন্য আরেকটি প্রসঙ্গে লেখক বলছেন, "ধনগছান ব্রতটী মূলধনের বহুগুণ সুদ প্রদানকারী একটী প্রকাণ্ড 'ব্যাঙ্ক' বিশেষ। দুই চারিটী কড়ি ও ধান, একটী পৈতার সহিত কোন ব্রাহ্মণকে গচ্ছিত স্বরূপ দান করিলেই পরজন্মে প্রচুর ধনধান্য লাভ হয়, সুতরাং নিতান্ত নির্বোধ ব্যতীত এমন সুযোগ কেহই পরিত্যাগ করিতে পারেন না।" কখনও বলছেন এই ব্রতর ছড়ায় যার যা আকাঙ্ক্ষা, এমন কি সুবর্ণের না হস্তীদন্তের খাড়ু— যার যা অভিরুচি তা প্রার্থনা করে নেওয়া যায়। শুধু ব্রত সম্বন্ধেই নয়, 'সংস্কৃতানভিজ্ঞ', 'ধনাকাঙ্ক্ষী' পুরোহিত সম্পর্কেও তাঁর মন্তব্য লক্ষ করার মতো। 'দশপুত্তল' ব্রত প্রসঙ্গে তিনি বলছেন, "আমাদের এই দুঃখদারিদ্র্যপীড়িত বঙ্গসমাজের 'পুরোহিত' মহাশয়েরা যদি স্বীয় নামের অর্থের প্রতি দৃষ্টি করিয়া আমাদের এই বালিকা পুরুত ঠাকরুণের নিঃস্বার্থ আচরণের অনুসরণ করেন, তাহা হইলে অনেক গরিব গৃহস্থ তাঁহাদের উৎপীড়ন হইতে মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হয়।" এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ব্রত-বিশেষে ব্রতস্তী নিজেই অথবা অন্য কোনও কুমারী পুরোহিতের কাজটি করতেন। এও বোধ করি প্রাক্-বেদ যুগের মাতৃতান্ত্রিক পরিবারের একটি চিহ্ন, যেখানে শাস্ত্রজ্ঞ পুরোহিতের প্রয়োজন ততটা জরুরি নয়। ব্রতস্তী তার নিজের কামনা, নিজের ভক্তি নিজেই নিবেদন করত, কখনও একাকী, কখনও সমবেতভাবে।

কিশোরী কন্যার পালনীয় 'হরি'চরণব্রত' প্রসঙ্গে অঘোরনাথ লিখছেন, "এই ব্রতটীকে নিতান্ত বাল্যক্রীড়া বলা যায় না, যেহেতু ইহাতে গুরু পুরোহিত স্বর্ণ রৌপ্য বস্ত্র প্রভৃতি অতি গুরুতর বিষয়ের সমাবেশ আছে। কোমলহৃদয়া সরল বালিকারাও গুরু পুরোহিতবর্গের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে নাই, ইহা তাঁহাদের অসাধারণ কার্য্যকুশলতার পরিচয় সন্দেহ নাই।" কিন্তু সাঁজপুজনী ব্রতে পুরোহিতদের অকৃতকার্য হবার কথাটি বলতেও লেখক ভোলেননি। উদ্‌যাপনের শেষ দিনে, "ব্রতচারিণীর সহোদর ভ্রাতা....... দণ্ডায়মান হইলে, ব্রতচারিণী ভগিনী ছাতার উপরে বিবিধ মিষ্টান্ন প্রভৃতি ফেলিয়া দিবে। পরে ভ্রাতাকে নববস্ত্র ও নবছত্র এবং নানারূপ মিষ্টদ্রব্য প্রদান করিলে ব্রত সাঙ্গ হইবে। এত বড় একটী অনুষ্ঠানে পুরোহিত মহশয়েরা অধিকার স্থাপন করিতে পারেন নাই। 'ভ্রাতা' মহাশয়ই তাঁহাদিগকে বঞ্চিত করিয়া 'নববস্ত্র' ও 'নবছত্র' আত্মসাৎ করিয়াছেন।"

এই ব্রতর অন্তে বলতে হয়,—

"যে বলে শোনে তার স্বর্গে বাস
যে ব্রত করে তার পোরে আশ ॥"

ব্রতের ফলশ্রুতি সম্বন্ধে লেখকের মন্তব্য হল— "ব্রতচারিণীর আশা পূর্ণ হউক আর না হউক, বক্তা প্রবন্ধ লেখক এবং শ্রোতা পাঠকবর্গ যে অতি সুলভ উপায়ে স্বর্গবাসের অধিকারী হইতে পারেন, লেখক ও পাঠকের পক্ষে ইহা অল্প সৌভাগ্যের বিষয় নহে।" —এই টুকরো টুকরো মন্তব্য থেকে অঘোরনাথের মনের ও ব্যক্তিত্বের একটি পরিচয় স্পষ্ট হয়। ধর্মের মধ্যেকার কপটতা ও অসততা তাঁকে গভীরভাবে বিচলিত করত। তাঁর বিভিন্ন লেখায় এই ক্ষোভ তিনি প্রকাশ করেছেন।

যেহেতু এই বইটিতে তিনি সংগ্রাহকের কাজ করেছেন, তাঁর মন্তব্য তিনি সংযত রেখেছেন। কিন্তু ব্রতকথাটির মূল্য এইখানেই, যে এর মধ্যে তখনকার সমাজের ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন চিত্র রক্ষিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, জনপ্রিয়তার আড়ালে নিঃশব্দে কাজ করে যাওয়া মানুষটি সম্বন্ধেও আমাদের ধারণা তৈরি হয়। বোঝা যায় এঁদের মতো মানুষেরা নীরবে সমাজের সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছেন।

কেবল গুরু-পুরোহিতই নয়, সঙ্কলক ব্রতপালনে নারী-পুরুষের সম্পর্কটিও উপেক্ষা করেননি। শস্‌পাতার ব্রতে নৃত্য-গীতাদির অনুষ্ঠানে ভাষার শ্লীলতা বেশির ভাগ সময়েই রক্ষিত হয় না। তাঁর মতে, হয়তো পুরুষবর্জিত বলেই এরকম হয়; কারণ "রমণী যাহা পুরুষের সমক্ষে করিতে পারেন না, এবং পুরুষ যাহা রমণীর সমক্ষে করিতে পারেন না, ধর্মানুষ্ঠান হউক আর আমোদপ্রমোদ হউক— তাহা ক্রমশঃ দূষিত হইবারই বিশেষ সম্ভাবনা। পরস্পরের প্রতি সম্ভ্রমবশতঃ যে আত্মসম্ভ্রম ও আত্মসংযমের উদয় হয়, তাহাই সকল অবস্থার মধ্যে পুরুষ ও নারীকে নীতি ও ধর্মের দিকে ধারণ করিয়া থাকে।" 'পরস্পর' ও 'আত্মসম্ভ্রম' শব্দ দুটি লক্ষণীয়। — আজ থেকে একশো বছর আগে লেখক পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সমভাবের কথা বলছেন; কোনও উচ্চ-নীচ সম্পর্কের কথা নয়। সকলেই যে ঠিক এইভাবে সম্পর্কটির বিশ্লেষণ করতেন তা নয়, তা হলে নারীনিগ্রহ, কুলীন-প্রথা ইত্যাদির প্রচলন এমন তীব্র আকার ধারণ করত না। তবে সমসাময়িক সমাজের অসারতার প্রতি এই যে আক্রমণ; এও সে যুগের আরেকটি লক্ষণ।

রবীন্দ্রনাথের যে চিঠিটির কথা আগেই বলেছি সেটির কথা না বললে এই উদ্ধৃতিকীর্ণ আলোচনাটি সম্পূর্ণ হবে না। 'সাধনা'-য় যখন এই লেখাগুলি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছে, তখন অনেকেই এ লেখা রবীন্দ্রনাথের বলে মনে করেছিলেন, বর্তমানেও কোনও প্রবন্ধকার বা গবেষক এ ভুল করেছেন। সাধনা-সম্পাদক প্রশংসা-পত্র লেখকদের ভ্রম সংশোধন না-করে স্বয়ং অঘোরনাথকেই এ বিষয়ে একটি চিঠি লেখেন। পূর্বে অপ্রকাশিত এই চিঠিতে কবি লিখেছিলেন : ওঁ

নমস্কারাঃসন্তু

তোমার 'ইন্দ্রপূজা' এবং মেয়েলি-ব্রত আমাদের সকলের এবং পাঠক-সাধারণের ভাল লেগেছে। মেয়েলি-ব্রত অনেকেই আমার লেখা বলে মনে করেছে। অন্যান্য ব্রতকথা যত পার সংগ্রহ করে পাঠিয়ে দিয়ো। ...

এই ছোট ব্রতকথার সঙ্কলনটি সম্বন্ধে আরও অনেক আলোচনার অবকাশ আছে। বিশেষত প্রাবন্ধিক অঘোরনাথ যখন রবীন্দ্রনাথের আগ্রহে এটি প্রকাশ করছেন এবং আরও লেখার তথা সংগ্রহের ইচ্ছা ব্যক্ত করছেন; তখন এটির গুরুত্ব সম্বন্ধে আমাদের নতুন করে ভাবায়।

ছবি : রবিকান্ত দ্বিবেদী